بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক ০২ ওফা, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকাল হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে আজও আলোচনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর এক নির্দেশনার ভিত্তিতে তিনি যখন ইহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকে ইয়েমেন থেকে বহিষ্কার করেন তখন তিনি তাদের জমি বাজেয়াপ্ত না করে ক্রয় করে নেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন,

ইয়েমেনের জমি যা খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অধীন ছিল তা খাজনার ভূমি ছিল কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.) সেই জমি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নিয়ে নেন এবং তাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে দেশান্তরিত করেন তখন তা রাজস্বভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং নীতগতভাবে রাষ্ট্রকেই এর মালিক মনে করা হতো– তাসত্ত্বেও তিনি তাদের কাছ থেকে এই জমি ছিনিয়ে নেন নি বরং ক্রয় করেছেন। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এই হাদীস লেখা আছে যে,

عن يحيى بن سعيد ان عمر اجلى اهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض ارضهم و كرومهم-

অর্থাৎ ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) নাজরানের মুশরিক, ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সেখান থেকে দেশান্তরিত করেন এবং তাদের জমি ও বাগ-বাগিচা ক্রয় করে নেন।

একথা স্পষ্ট যে, ইহুদীদের জমিন উশরী হতে পারে না কেননা তা উশরী হলে এর মালিক কোন মুসলমান হওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে ইহুদীদের কাছ থেকে তা ক্রয় করার প্রশ্নই ছিল না। এসব জমি নিঃসন্দেহে রাজস্বভুক্ত বা খাজনার জমি ছিল যেমন হিন্দুস্তানের ভুমিকেও খারাজী বলা হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.) উক্ত জমিকে খারাজী আখ্যা দিয়ে, রাষ্ট্রকে এর মালিক আখ্যা দিয়ে তা বাজেয়াপ্ত করেন নি বরং উক্ত জমি ক্রয় করেছেন। কেউ বলতে পারে, এই জমি মনে হয় খারাজীও ছিল না, উশরীও ছিল না, সম্ভবত অন্য কোন ধরণের ছিল। এমন ধারণা করা অবান্তর এবং ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। উশরী এবং খারাজী ছাড়া ইসলামে আর কোন জমি নেই, তবে যে জমি একক কোন মালিকানাধীন না হয়ে পতিত ভূমি হয়ে থাকে তার কথা ভিন্ন। তাই, নাজরানবাসী ইহুদী-খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের জমি নিঃসন্দেহে খারাজী ছিল বা উশরী ছিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হযরত উমর (রা.) জমির দখলদারকেই মালিক আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে সেই জমি ক্রয় করা হয়েছে।

ইসলামে যুদ্ধবন্ধী ছাড়া অন্য কাউকে ক্রীতদাস বানানোর নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا (সূরা আল্ আনফাল: ৬৮) অর্থাৎ হে মুসলমানেরা! তোমরা কি অন্যান্য লোকদের ন্যায় বিজাতীয়দের পাকড়াও করে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে চাও? وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, তোমরা পার্থিবতার পেছনে ছুটে বেড়াবে এটি আল্লাহ্ চান না বরং তিনি তোমাদেরকে সেসব বিধিবিধান অনুসারে পরিচালিত করতে চান যা পরিণামের দিক থেকে তোমাদের জন্য উত্তম এবং যা পরকালে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার যোগ্যপাত্র বানাবে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরিণাম উত্তম হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিধানই তোমাদের জন্য অধিকতর শ্রেয় যে, তোমরা যুদ্ধবন্দীদেরকে ছাড়া যাদেরকে যুদ্ধের সময় বন্দী করা হয় অন্য কাউকে বন্দী করবে না। এক কথায় যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্য কোন ধরনের বন্দী বানানো ইসলামে বৈধ নয়। এই নির্দেশনায় ইসলামের প্রথম দিকে কঠোরভাবে আমল করা হতো অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে একবার ইয়েমেনের এক প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আসে এবং অভিযোগ করে যে, আমরা স্বাধীন গোত্র ছিলাম, ইসলামের পুর্বে আমাদেরকে খ্রিস্টানরা জোরপূর্বক কোন যুদ্ধ ছাড়াই দাস বানিয়ে নিয়েছিল। আমাদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদিও এটি ইসলামের পূর্বের ঘটনা তবুও আমি বিষয়টির তদন্ত করব। যদি তোমাদের কথা সঠিক হয় তাহলে তোমাদেরকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেয়া হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্তমান ইউরোপের সাথে এর তুলনা করছেন যে, এটিই ছিল ইসলামী শিক্ষা যার ওপর হযরত উমর (রা.) আমল করিয়েছেন বা এ সম্পর্কে তাদের আশ্বস্ত করেছেন কিন্তু এর বিপরীতে ইউরোপে কী হয়? ইউরোপ নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ও বিস্তারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এই দাসপ্রথা বহাল রাখে। এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলামের ইতিহাস থেকে অমুসলিম দাসত্বের বিষয়টিও আমরা জানতে পারি কিন্তু তা সত্ত্বেও দাসদের মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর ইসলামে এর কোন অস্তিত্বই নেই।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর মদীনা ও এর চতুষ্পার্শ্বে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যখন প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হত তখন ছাইয়ের মত মাটি উড়ে আসত এজন্য এ বছরের নাম **'আমুর রামাদা'** বা ছাইয়ের বছর রাখা হয়। অওফ বিন হারেস তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, এই বছরের নাম **আমুর রামাদা** অর্থাৎ ছাইয়ের বছর রাখা হয় কেননা, অনাবৃষ্টির কারণে পুরো ভূমি কালো হয়ে ছাই সদৃশ হয়ে গিয়েছিল আর এই অবস্থা নয় মাস পর্যন্ত ছিল। হিযাম বিন হিশাম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, ১৮ হিজরীতে যখন লোকেরা হজ্জ থেকে ফেরত আসে তখন তারা খুবই কষ্টের সম্মুখীন হয়। দেশে চরম অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, গবাদি পশু মারা যায় এবং লোকেরা না খেয়ে মরতে থাকে, এমনকি মানুষ নরম হাড় পিষে তা পানিতে মিশিয়ে খেতে আরম্ভ করে। আর ইদুরের গর্ত খুড়ে সেখানে যা থাকত তা বের করে আনত। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত আমর বিন আ'স

(রা.)'র উদ্দেশ্যে সেই বছর অর্থাৎ আমুর রামাদাতে চিঠি লিখেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। 'আল্লাহ্‌র বান্দা উমর, আমীরুল মু'মিনীন এর পক্ষ থেকে আ'সী বিন আ'সীর নামে এই পত্র। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এরপর বলছি, তুমি কি আমাকে এবং যারা আমার সাথে আছে তাদেরকে মৃত দেখতে চাও আর তুমি ও তোমার কাছে যারা আছে তারা জীবিত থাকবে? আর কোন সাহায্যকারী আছে কী? তিনি (রা.) তিনবার লিখেন, সাহায্য! সাহায্য! সাহায্য!' এর উত্তরে হযরত আমর বিন আ'স (রা.) লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় তাঁর বান্দার প্রতি। আম্মা বা'দ! আপনার কাছে সাহায্য পৌঁছে যাচ্ছে, স্বল্পকাল অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের অভিমুখে উটের একটি কাফেলা প্রেরণ করছি যার প্রথম উট আপনার কাছে থাকবে এবং শেষ উট আমার কাছে থাকবে অর্থাৎ উটের একটি দীর্ঘ কাতার পাঠানো হবে। মিসরের গভর্নর হযরত আমর বিন আ'স (রা.) খাদ্যশস্য বোঝাই এক হাজার উট প্রেরণ করেন। ঘি এবং কাপড় প্রভৃতি এর বাইরে ছিল। ইরাকের গভর্নর হযরত সা'দ খাদ্যশস্য বোঝাই তিন হাজার উট প্রেরণ করেন, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণ এর বাইরে ছিল। সিরিয়ার গভর্নর হযরত আমীর মুয়াবিয়া দুই হাজার উট বোঝাই খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণ এর বাইরে ছিল। খাদ্যশস্যের প্রথম কাফেলা যখন আসে তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে বলেন, তুমি কাফেলাকে থামিয়ে গ্রামবাসীদের দিকে পাঠিয়ে দাও এবং প্রথমে তাদেরকে দাও আর তাদের মাঝে তা বন্টন করে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! হতে পারে মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যের পর এর চেয়ে উত্তম কিছু হয়ত তোমরা পাওনি। এগুলোর বস্তা দিয়ে লেপ বানিয়ে দাও যা তারা পরিধান করবে এবং উটগুলো তাদের জন্য জবাই করে দিও যেন তারা এর মাংস খেতে পারে এবং এর চর্বি সংরক্ষণ করে। তুমি তাদের একথা বলার অপেক্ষা করো না যে, আমরা বৃষ্টি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আল্লাহ্ তা'লার স্বাচ্ছন্দ্য দেয়ার আগ পর্যন্ত তারা যেন আটা রান্না করে এবং অবশিষ্ট মজুদ করে। অর্থাৎ তারা যেন কিছু আটা রান্না করে নিজেরা খেয়ে বাকিটুকু মজুদ করে। হযরত উমর (রা.) খাবার প্রস্তুত করাতেন এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলতো, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার জন্য আসতে ও খেতে চায় চায় সে যেন এমনটি করে। আর যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে খাবার নিয়ে যেতে চায় সে নিয়ে যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) লোকদেরকে **শরীদ** খাওয়াতেন। রুটি ছিড়ে ঝোলে ভিজিয়ে প্রস্তুত করা খাবারকে শরীদ বলে। এটি এক ধরণের রুটি যার সাথে জলপাইয়ের তৈরী তরকারী যা ডেকচিতে চটজলদি রান্না করা হতো। উট জবাই করা হতো এবং হযরত উমর (রা.) নিজেও সবার সাথে বসে সেভাবেই খাবার খেতেন যেভাবে অন্যরা খাবার খেত।

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসলাম তার দাদা আসলাম (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) টানা রোযা রাখতে থাকেন। **আমুর রামাদাহ্**'র যুগে সন্ধ্যাবেলায় হযরত উমর (রা.)'র কাছে জলপাই-এর তেল মিশ্রিত রুটি পরিবেশন করা হতো। একদিন লোকেরা উট জবাই করে লোকদেরকে আহার করায়। তারা হযরত উমর (রা.)'র জন্য উটের মাংসের উপাদেয় অংশটি

রেখে দিয়েছিল। যখন সেগুলো তাঁর সামনে পরিবেশন করা হয় তখন দেখা গেল, সেখানে উটের কুঁজের মাংস ও কলীজার টুকরো ছিল। যখন হযরত উমর (রা.) জানতে চান, এগুলো কোথা থেকে এসেছে, তখন উত্তরে বলা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন এগুলো সেই উটের মাংসের অংশ যেগুলো আজ আমরা জবাই করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি যদি নিজে (উটের) উপাদেয় অংশ খাই আর অন্যদেরকে মন্দ অংশ খাওয়াই, তবে আমি কতই না মন্দ তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হব! এই মাংসের বাটি নিয়ে যাও আর অন্য কোন খাবার থাকলে সেটা আমার জন্য নিয়ে আস। এরপর তাঁর জন্য রুটি এবং জলপাই এর তেল আনা হয়। তিনি নিজ হাতে রুটি গুলো ছোট ছোট টুকরো করে শরীদ বানান। তারপর তিনি তাঁর ভৃত্যকে বলেন, হে ইয়ারফা', তোমার মঙ্গল হোক। এই বাটি সামাকের একটি বাড়িতে নিয়ে যাও। সামাক মদীনার নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানের নাম ছিল, যার মালিক ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তিনি সেই বাগানটি ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, তিন দিন হয়ে গিয়েছে আমি সেই বাড়িতে কোন খাবার পাঠাইনি। আমার ধারণা হল, তারা অভুক্ত আছেন। এই বাটি নিয়ে তাদের সামনে পরিবেশন কর।

হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) নতুন একটি রীতির সুচনা করেন যা তিনি এর পূর্বে করতেন না। তা হল লোকদেরকে এশার নামায পড়িয়ে তিনি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করতেন এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বিরতিহীন নামায পড়তে থাকতেন। এরপর তিনি (রা.) বের হতেন এবং মদীনার চারিপাশ প্রদক্ষিণ করতেন। একরাতে সেহরীর সময় আমি তাঁকে (রা.) এই দোয়াটি পড়তে শুনেছি: **"আল্লাহুম্মা লা তাজআল হালাকা উম্মাতি মুহাম্মাদিন আলা ইদাইয়া"**। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ধ্বংস করো না।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান (রা.) বর্ণনা করেন, দুর্ভিক্ষের সময় একদিন হযরত উমর (রা.)'র নিকট চর্বিতে ডুবানে রুটি পরিবেশন করা হয়। তিনি (রা.) এক মরুবাসীকে ডেকে তাকে পাশে বসান আর সে তাঁর (রা.) সাথে বসে খাবার খেতে থাকে। সে ব্যক্তি দ্রুত বাটির কিনারা থেকে চর্বি খাচ্ছিল। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি এমন ভাবে খাচ্ছ যেন জীবনে কখন চর্বি দেখনি! সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, অনেকদিন যাবৎ আমি ঘি-ও খাইনি আর জলপাইও আমার কপালে জুটেনি। শুধু যে নিজে খেতে পাইনি তা-ই নয়, অন্য কাউকেও আমি এগুলো খেতে দেখিনি। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) শপথ করেন যে, লোকেরা পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাংস বা ঘি কোনটাই মুখে তুলবেন না।

ইবনে তাউস তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, জনগণের সুদিন ফেরার আগ পর্যন্ত হযরত উমর (রা.) মাংস বা ঘি কোনটাই খান নি। ঘি জাতীয় খাবার না খেয়ে শুধুমাত্র তেল জাতীয় খাবার খাওয়ার কারণে তার (রা.) পেটে গুরগুর করত। তিনি (রা.) তাঁর পেটকে সম্বোধন করে বলতেন, তুমি গুরগুর করতে থাকো, আল্লাহ্র কসম! যতদিন লোকদের সুদিন না আসবে এবং যতদিন তারা পূর্বের মত খাবার আরম্ভ না করবে, তেল ছাড়া তোমার ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না।

এয়্যায বিন খলীফা বলেন, দুর্ভিক্ষের বছর হযরত উমর (রা.)-কে আমি দেখেছি, তাঁর (গায়ের) রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, অথচ পূর্বে তিনি ফর্সা ছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করি, এটি কীভাবে হল? তখন বর্ণনাকারী উত্তরে বলেন, হযরত উমর (রা.) একজন আরব ছিলেন, তিনি ঘি ও দুধ ব্যবহার করতেন। কিন্তু মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হলে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জন্য তিনি এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তেল দিয়ে খাবার খেতেন যে কারণে তাঁর গায়ের রং পাল্টে যায় আর অনাহারের কারণে তাঁর গায়ের রং আরও বেশি বদলে যায়।

উসামাহ্ বিন যায়েদ বিন আসলাম তার দাদার বরাতে বর্ণনা করেছেন, আমরা বলতাম– আল্লাহ্ যদি দুর্ভিক্ষ দূর না করেন তাহলে হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের জন্য দুশ্চিন্তা করে মরেই যাবেন। যায়েদ বিন আসলাম নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, দুর্ভিক্ষের যুগে গোটা আরব থেকে মানুষ মদীনা আসে। হযরত উমর (রা.) লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন তাদের (থাকার) ব্যবস্থা করে এবং তাদেরকে খাবার খাওয়ায়। মদীনার চার দিকেই বিভিন্ন সাহাবীকে দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, তারা তাঁকে সন্ধ্যার সময় একত্র হয়ে প্রতি মুহূর্তের সংবাদ দিতেন। সকল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেসব সংবাদই (সংগৃহীত) হত সেই সংবাদ সন্ধ্যায় তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়া হত। মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলের বেদুঈনরা এসেছিল। একরাতে রাতের খাবারের পর হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দেন, আমাদের সাথে যারা রাতের খাবার খেয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা কর। অতএব, তাদের গণনা করলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাত হাজার জন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, যারা আসে নি তাদের এবং রোগী ও শিশুদেরও গণনা কর। গণনা করার পর দেখা গেল তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। কিছু দিন পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই পুনরায় গণনা করা হয়। যারা তাঁর সাথে খাবার খাচ্ছিল তাদের সংখ্যা হয় দশ হাজার এবং অন্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। এভাবেই এ ধারা অব্যাহত থাকে আর একপর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ্টি হওয়ার পর আমি হযরত উমর (রা.)-কে দেখি, তিনি তাঁর কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন সবাইকে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন আর তাদেরকে খাদ্যশস্য এবং বাহনও সরবরাহ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি সেই লোকদের যাত্রা করানোর জন্য হযরত উমর (রা.) নিজেই আসতেন। আশেপাশের মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে (গ্রাম) ছেড়ে শহরে চলে এসেছিল এখানে তারা খাবার পেত। পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে যায়, বৃষ্টি হয় আর চাষাবাদ ইত্যাদি করা সম্ভবপর ছিল, তখন তিনি (রা.) বলেন, এখন ফিরে যাও, পরিশ্রম কর আর চাষাবাদ কর।

তাবরীর ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া সম্পর্কে লেখা আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, যাতে মহানবী (সা.) দোয়া করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ঘোষণা করান যে, এস্তেস্কার নামায (অর্থাৎ বৃষ্টি জন্য নামায) পড়া হবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, বিপদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, এখন আল্লাহ্ চাইলে এর অবসান ঘটতে যাচ্ছে। যে জাতি দোয়া করার সুযোগ লাভ করে তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, তাদের বিপদ কেটে গেছে। তিনি (রা.) বিভিন্ন শহরের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে পত্র লেখান যে, তোমার মদীনা এবং এর আশেপাশে বসবাসরত আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য এস্তেস্কার নামায পড়, কেননা তাদের বিপদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এস্তেস্কার নামায পড়ার জন্য হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে বাইরে উন্মুক্ত মাঠে সমবেত করেন আর হযরত আব্বাস (রা.)-কে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন,

সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং নামায পড়ান আর এরপর পা ভাজ করে বসে দোয়া করতে আরম্ভ করেন। اللهم اياك نعبد و اياك نستعين اللهم اغفرلنا وارحمناوارض عنا **"হে আমার আল্লাহ্! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য যাচনা করি। হে আমার আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও।"** এরপর তিনি (রা.) ফিরে যান। তাঁর বাড়িতে পৌঁছানোর পূর্বেই বৃষ্টির কারণে মাঠে পানি জমে যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) এভাবে দোয়া করেন, **"হে আল্লাহ্! তোমার নবী (সা.)-এর যুগে আমরা যখন খরা পীড়িত হতাম তখন তোমার নবী (সা.)-এর দোয়াই দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম আর তুমি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আজ আমরা তোমার নবী (সা.)-এর চাচার দোহাই দিয়ে দোয়া করছি। অতএব, তুমি আমাদের এই দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও আর আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর।"** এরপর লোকদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করার পূবেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

মসজিদে নববীতে কবে থেকে চাটাই বা মাদুর বিছানো শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইব্রাহীম বর্ণনা করেছেন, প্রথমে মানুষ নামায পড়ত, মাটিতে বা কাঁচা মেঝেতে। ফলে মানুষের কপালে মাটি লেগে যেত। কিন্তু পরবর্তীতে চাটাই বা মাদুর বিছানোরা প্রথা চালু হয়। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ বিন ইব্রাহীম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদ নববীতে সর্বপ্রথম চাটাই বিছিয়েছেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। প্রথমে মানুষ সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর নিজেদের হাত ঝেড়ে নিত। এটি দেখে তিনি (রা.) চাটাই বিছানোর নির্দেশ দেন আর তা **আকীক** থেকে এনে মসজিদে নববীতে বিছানো হয়। **আকীক**ও একটি উপত্যকার নাম যা মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকা। এটি অনেক বড় একটি উপত্যকা ছিল।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে ১৭ হিজরী সনে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণও করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল আর এর ছাদ খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে বানানো হয় এবং খুঁটি ও স্তম্ভ ছিল খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একে সেভাবেই থাকতে দেন এবং এতে কোন সম্প্রসারণ কিংবা পরিবর্তন করেন নি। হযরত উমর (রা.) এর পুনঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করান। কিন্তু এর আকৃতি ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন করান নি। তিনিও একে একই রকম নির্মাণশৈলীতে নির্মাণ করান। সেই আগের মতই খেজুর পাতার ছাদ থাকে। তিনি (রা.) কেবল কাঠের খুঁটি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজের তত্ত্বাবধানে ১৭ হিজরী সনে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করান। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদের আয়তন ১০০X১০০ বর্গগজ, অর্থাৎ ৫০X৫০ বর্গমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪০X১২০ বর্গগজ, অর্থাৎ ৭০X৬০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়। এই বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে মসজিদে নববী ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র পুনঃনির্মাণের পর এর আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (তিনি বলেন), হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণের এবং লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু অনেক বেশি সাজসজ্জা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় কেননা এ ধরণের সাজসজ্জাই মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করে। হযরত উমর (রা.) এ কাজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন আর মসজিদকে তিনি

ঠিক সেভাবেই মজবুত করে গড়ে তোলেন যেমনটি ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে। মসজিদ সম্প্রসারণের সময় মসজিদ সংলগ্ন উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল। কিছু মানুষ সানন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জমি মসজিদের নামে দান করে দেন কিন্তু কিছু জমির জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পারস্পরিক সমঝোতা এবং আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এভাবে তাঁকে কিছুটা জমি ক্রয় করে মসজিদের সাথে সন্নিবেশিত করতে হয়।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে আদমশুমারি প্রথাও শুরু হয় বা তিনি এর প্রবর্তন করেন এবং প্রাত্যহিক খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মনীতি কীভাবে পরিচালিত হতো আর পরে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রশাসনিক বিষয়ে কী কী নতুনত্ব আনা হয়েছে– এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন,

মহানবী (সা.) মদীনা এসেই সর্বপ্রথম সম্পদহীনদেরকে সম্পদশালীদের ভাই বানিয়ে দেন। আনসাররা সম্পত্তির মালিক ছিল আর মুহাজিররা ছিল সম্পত্তিহীন। মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন আর একজন সম্পত্তির মালিককে একজন সম্পত্তিহীন লোকের সাথে যুক্ত করে দেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ এতটাই বাহুল্য করেন যে, সহায়-সম্পত্তি তো দূরের কথা কারো দু'জন স্ত্রী থাকলে তারা তাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এ প্রস্তাব দেন যে, তারা তাদের জন্য একজন স্ত্রীকে তালাক দিতেও প্রস্তুত আছেন; তারা নিঃসঙ্কোচে তাদের বিয়ে করে নিতে পারে। এটি ছিল **সাম্যের প্রথম দৃষ্টান্ত** যা মহানবী (সা.) মদীনায় যাওয়া মাত্রই প্রতিষ্ঠা করেন, কেননা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন মদীনাতেই হয়েছিল। সেই যুগে তেমন অর্থসম্পদ ছিল না, তাই এ পন্থাই খোলা ছিল যে, ধনী-গরীবকে যেন পরস্পরের সাথে এভাবে মিলিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা প্রত্যেকে খাবারের জন্য কিছু না কিছু পায়। এরপর এক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এই পন্থা অবলম্বন করেন, যদিও (পরবর্তীতে) এর কাঠামো বদলে দেন। এক যুদ্ধের সময় তিনি (সা.) জানতে পারেন, কারো কারো কাছে খাবার জন্য কিছুই নেই আর থাকলেও তা নিতান্তই অপ্রতুল, কিন্তু কারো কারো কাছে প্রচুর জিনিস রয়েছে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছে যা কিছুই আছে তা নিয়ে এসো এবং এক স্থানে একত্র কর। অতএব, সব জিনিস আনা হলে তিনি (সা.) রেশন ব্যবস্থা চালু করেন। এক কথায় এক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়াই চালু হল যে, সবাইকে খাবার পেতে হবে। যতদিন সম্ভব ছিল সবাই যার যার মত খেতে থাকে কিন্তু যখন এটি অসম্ভব হয়ে যায় এবং কারো কারো অভুক্ত থাকার শঙ্কা দেখা দেয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, এখন তোমাদের পৃথক পৃথকভাবে খাবার খাওয়ার অনুমতি নেই, সবাই এখন একস্থান থেকে সমপরিমাণ খাবার পাবে। সাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল; সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম (তথা সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদ)-এর ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। যাহোক, সাহাবীরা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর এ নির্দেশ আমরা এত কঠোরভাবে পালন করি যে, আমাদের কাছে একটি খেজুর থাকলে তা খাওয়াকে আমরা অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা মনে করতাম এবং তা সরকারী ভাণ্ডারে জমা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতাম না। এটি ছিল মহানবী (সা.) প্রদর্শিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। যতদিন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল ততদিন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে আর এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন মহানবী (সা.)।

এরপর মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রাচুর্যও আসে আর ইসলামের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ধনভাণ্ডার খুলেও দেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল, মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী যুগেই যেন

এ–সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা চালু হয় যাতে মানুষ একথা বলতে না পারে যে, এটি কেবল মহানবী (সা.)-এর বিশেষত্ব ছিল, অন্য কেউ এটি চালু করতে পারে না। প্রাচুর্য এলে পুরোনো ব্যবস্থাপনা চালু হয়ে যায় আর আল্লাহ্ তা'লা একে পরবর্তীতেও বহাল রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সেটি কীভাবে? তিনি (রা.) লিখেন,

অতএব একদিকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর অন্যদিকে মদীনায় পৌঁছতেই আনসাররা তাদের সহায়-সম্পদ মুহাজিরদের সামনে উপস্থাপন করেন। মুহাজিররা বলেন, আমরা এ সমস্ত জায়গা-জমি বিনামূল্যে নিব না, আমরা এসব জমিতে কৃষক হিসেবে চাষাবাদ করব আর তোমাদের অংশ তোমাদেরকে প্রদান করব। কিন্তু এটি মুহাজিরদের পক্ষ থেকে তাদের একটি ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছিল মাত্র। আনসাররা তাদের ধনসম্পদ দানের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা করেন নি। এটি তেমনই যেমন সরকার রেশন দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করছে না। এতে সরকারের ওপর কোন আপত্তি বর্তাবে না। এটিই বলা হবে যে, সরকার রেশন নির্ধারণ করে দিয়েছে নেয়া বা না নেয়ার বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। অনুরূপভাবে আনসাররা সবকিছু দিয়ে দিলেও মুহাজিররা তা গ্রহণ না করলে– সেটি ভিন্ন কথা। মোটকথা ব্যবহারিকভাবে এই কাজ মহানবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায়ই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এমনকি যখন বাহরাইনের বাদশাহ্ মুসলমান হয় তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তোমার দেশে যাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন জমি নেই তুমি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনধারণের জন্য চার দিরহাম এবং পোশাক দান কর যেন তারা ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় না থাকে। এরপর মুসলমানদের কাছে সম্পদ আসতে আরম্ভ করে। মুসলমানদের সংখ্যা যেহেতু স্বল্প ছিল আর সম্পদ বেশি ছিল তাই তখন কোন নতুন আইন প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব হয় নি, কেননা চাহিদা পূর্ণ হচ্ছিল। নীতি হল, আশংকার সময় আইন প্রয়োগ করতে হয়। আর যখন আশংকা থাকে না তখন সরকার সে আইন প্রয়োগ করতে পারে আবার চাইলে না-ও করতে পারে। এ কথাগুলো কথাপ্রসঙ্গে বললাম, কিন্তু এখন যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম তা হল মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর এই ব্যবস্থাপনা কীভাবে প্রচলিত হয়।

মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন আর মুসলমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন বিজাতিরাও ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আরবরা তো একটি গোষ্ঠি এবং এক জাতিসত্তা হিসেবে বসবাস করত আর তারা পরস্পরের মাঝে সাম্যও বজায় রাখত। ইসলাম যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে আর বিভিন্ন জাতি ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তখন তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে হযরত উমর (রা.) সবার আদমশুমারি করান এবং রেশন দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেন, যা বনু উমাইয়্যার যুগ পর্যন্ত চালু থাকে। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরাও এটি স্বীকার করে যে, সর্বপ্রথম আদমশুমারি হযরত উমর (রা.) করিয়েছিলেন আর তারা এটিও স্বীকার করে যে, হযরত উমর (রা.) এই সর্বপ্রথম আদমশুমারি জনগণের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য নয়, বরং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য করিয়েছিলেন। অন্যান্য সরকার আদমশুমারি করায় যেন জনগণের ওপর কাজ চাপানো যায় এবং তাদের সামরিক কাজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু হযরত উমর (রা.) এজন্য আদমশুমারি করান নি যে, মানুষ কুরবানির পশুতে পরিণত হবে, বরং এজন্য করিয়েছেন যেন তাদের পেট ভরার ব্যবস্থা হয়। এটি যেন বোঝা যায় যে, মানুষের সংখ্যা কত আর কতটা খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব, আদমশুমারির পর সবাইকে একটি নির্দষ্ট পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। এছাড়া

যেসব প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকত তার জন্য তাদেরকে মাসিক কিছু ভাতা দেয়া হতো। এই বিষয়ে এত সতকর্তা অবলম্বন করা হতো যে, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন সিরিয়া জয় হয় আর সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জলপাইয়ের তেল আসে তখন তিনি একবার মানুষকে বলেন, (সবাই তখন জলপাইয়ের তেল পেতে থাকে), জলপাইয়ের ব্যবহারে আমার পেট ফেঁপে উঠে। অর্থাৎ হযরত উমরও সেখান থেকে তেল নিতেন, তিনি বলেন, আমি জলপাই অধিক ব্যবহার করলে আমার পেট ফেঁপে উঠে। তোমরা আমাকে অনুমতি দিলে আমি বায়তুল মাল থেকে সমপরিমাণ মূল্যের ঘি নিতে পারি। অর্থাৎ জলপাইয়ের মূল্য যতটা হয় সেই পরিমাণ মূল্যের ঘি নিতে কেননা জলপাই আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। মোটকথা, এটি প্রথম পদক্ষেপ ছিল যা ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। আর জানা কথা যে, যদি এই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে এর পর আর কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থাকে না, কেননা পুরো দেশের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তখন সরকারের ওপর থাকবে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা তাদের অসুস্থতায় চিকিৎসা এগুলোর সবই ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকবে। যদি এসব চাহিদা পূরণ হতে থাকে তাহলে কোনরূপ বীমা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। বীমা তো মানুষ এজন্যই করিয়ে থাকে যেন তারা নিজেদের অবর্তমানে সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারে; কিংবা যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে, উপার্জনক্ষম থাকবে না– তখন যেন নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যদি রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে আর কোন ধরনের বীমার প্রয়োজন থাকে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও লিখেন, কিন্তু পরবর্তীতে আগতরা একথা বলতে আরম্ভ করে যে, এটি বাদশাহ্‌র ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে কিছু দিতেও পারেন অথবা চাইলে না-ও দিতে পারেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নি, তাই তারা পুনরায় রোমান ও পারসীদের রীতি-নীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অন্য রাজা-বাদশাহ্‌রা যেমনটি করত, সেই রীতিই পরবর্তীতে প্রচলিত হয়ে যায়।

প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন,

ইসলামী রাষ্ট্র যখন সেই সম্পদের অধিকারী হয়, তখন তা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। এখন [এটিই বর্ণিত হয়েছে যে,] হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন ব্যবস্থাপনা সুসংগঠিত হয়, তখন ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের, আর তা নিজের এই কর্তব্য পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করত। হযরত উমর (রা.) এতদুদ্দেশ্যে আদমশুমারির প্রচলন করেন এবং রেজিস্টার চালু করেন, যাতে সব নাগরিকের নাম লিপিবদ্ধ করা হতো। [যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে,] ইউরোপীয় লেখকগণও একথা স্বীকার করেন যে, সর্বপ্রথম আদমশুমারি হযরত উমর (রা.) করেন এবং তিনিই রেজিস্টারের পদ্ধতি চালু করেন। এই আদমশুমারির উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা। রাষ্ট্রের জন্য এটি জানা আবশ্যক যে, দেশের জনসংখ্যা কত। আজ একথা বলা হয় যে, সোভিয়েত-রাশিয়া দরিদ্রদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করেছে। অথচ সর্বপ্রথম এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন করেছিল ইসলাম, আর কার্যত হযরত উমর (রা.)'র যুগে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি উপশহর ও প্রতিটি শহরের সব নাগরিকের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হতো; প্রত্যেক ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তানদের নাম এবং তাদের সংখ্যা লিখে রাখা হতো আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খাদ্যেরও একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, যেন যারা স্বল্পাহারী তারাও তা দিয়ে চলতে

পারে, আর যারা বেশি খায় তারাও নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে খেতে পারে। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) প্রথমদিকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তাতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা বিবেচনা করা হয় নি আর তাদেরকে তখনই শস্য ইত্যাদি রূপে কোন সাহায্য প্রদান করা হতো, যখন মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ ছাড়িয়ে দিতো। [যেভাবে বিগত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম,] একরাতে হযরত উমর (রা.) জনগণের অবস্থা জানার জন্য টহল দিচ্ছিলেন; হঠাৎ একটি তাঁবু থেকে কোন শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসে। হযরত উমর (রা.) সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন; শিশুটি কেঁদেই যাচ্ছিল এবং মা তাকে পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। এভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) সেই তাঁবুর ভেতরে যান এবং সেই নারীকে বলেন, তুমি বাচ্চাকে দুধ কেন খাওয়াচ্ছ না? এ কতক্ষণ ধরে কাঁদছে! সেই নারী তাকে (রা.) চিনতে পারে নি, সে ভেবেছে সাধারণ কোন লোক হবে হয়ত; সে উত্তরে বলে, তুমি কি জান না, উমর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরা রেশন পাবে না? আমরা দরিদ্র মানুষ, কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দিন চলে। আমি এই বাচ্চার দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি যেন বায়তুল মাল থেকে তার জন্যও রেশন পাওয়া যায়। এ যদি এখন কাঁদে, তবে সেই কান্নার জন্য উমর দায়ী হবে, যে এমন আইন বানিয়েছে! হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন এবং পথিমধ্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে একথা বলতে থাকেন যে, উমর! উমর! জানি না এ আইনের মাধ্যমে আরবের কত শিশুদের দুধ ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুমি দুর্বল করেছ। এর সমুদয় পাপ এখন তোমার ওপর বর্তাবে। একথা বলতে বলতে তিনি এসে গুদামের দরজা খুলেন এবং আটার একটি বস্তা নিজের কাঁধে তুলে নেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাকে দিন, এটি আমি বহন করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, না ভুল আমি করেছি, তাই পরিণামও আমাকেই ভোগ করতে হবে। অতএব, আটার সেই বস্তাটি তিনি ঐ নারীর কাছে পৌঁছে দেন আর পরদিনই নির্দেশ জারি করেন যে, শিশু যেদিন জন্ম নিবে সেদিন থেকেই তার জন্য রেশন নির্ধারিত হবে, কেননা তার মা, যে তাকে দুধ পান করায়, তার অধিক খাবারের প্রয়োজন।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কেবল ইসলামই রাষ্ট্রীয় অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং ইসলামই সর্বপ্রথম এ নীতি প্রচলন করেছে। এখন অন্যান্য রাষ্ট্রও এর অনুকরণ করছে, কিন্তু পূর্ণরূপে নয়। বীমা করা হচ্ছে, ফ্যামিলি পেনশন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যৌবন ও বার্ধ্যক্য উভয় কালেই খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের- এ নীতি ইসলামের পূর্বে অন্য কোন ধর্ম উপস্থাপন করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আদমশুমারি এজন্য করায় যেন ট্যাক্স নেয়া যায় বা সৈন্য নিয়োগের ব্যাপারে ধারণা করা যায় যে, প্রয়োজনের সময় ক'জন যুবক পাওয়া যাবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম আদমশুমারি, যা হযরত উমর (রা.)'র যুগে করা হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল সব মানুষের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা, তা ট্যাক্স বসানোর জন্য ছিল না বা এ ধারণা নেয়ার জন্য নয় যে, প্রয়োজনের সময় সেনাবাহিনীর জন্য কতজন যুবক পাওয়া যাবে। বরং সেই আদমশুমারি কেবল এজন্য ছিল যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য ও বস্ত্র দেয়া যায়। নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর যুগেও একটি আদমশুমারি হয়েছিল। কিন্তু তখনও মুসলমানরা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেনি। এজন্য সেই আদমশুমারির উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করা। ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম আদমশুমারি হযরত উমর (রা.)'র যুগেই হয়েছিল এবং সেটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য হয়েছিল। এটি কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেবল এটি বলে দেয়া যে, আবেদন কর, বিবেচনা করা হবে। আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হবে এরপর ভেবে দেখা হবে! এটি সব মানুষের আত্মাভিমান সহ্য করতে পারে না। এজন্য ইসলাম এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং এটি ধনী-দরিদ্র সবাইকেই দেয়া হবে; সে কোটিপতিই হোক না কেন, সে তা অন্য কাউকে দিয়ে দিক না কেন, যেন কেউ এটি মনে না করে যে, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়। যখন ধনীরা পাবে, তারা যদি তাক্বওয়াশীল হয় তবে তারা তা নিজে খরচ না করে অভাবীদের দিয়ে দিবে।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে রাজ্যগুলোকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। ২০ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) রাজ্যগুলোকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন যেন প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হয়। ১ম মক্কা, ২য় মদীনা, ৩য় সিরিয়া, ৪র্থ জাযিরা, ৫ম বসরা, ৬ষ্ঠ কূফা, ৭ম মিসর ও ৮ম ফিলিস্তিন।

এরপর তাঁর যুগেই শূরার প্রচলন হয়। মজলিসে শূরাতে সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে সে দু'টি দল অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের কর্মকর্তাগণ অংশ নিতেন। আনসারগণও দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন, অওস ও খাযরায। অতএব, এ দু'টি গোত্রেরই মজলিসে শূরায় অংশ নেয়া আবশ্যক ছিল। এই মজলিসে শূরায় হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) অংশগ্রহণ করতেন। মজলিসে শূরা অনুষ্ঠানের যে রীতি ছিল তা হল, প্রথমে একজন ঘোষণাকারী **'আস্ সালাতু জামে'** বলে ঘোষণা দিত, অর্থাৎ সকলে নামযের জন্য একত্রিত হয়ে যাও। যখন লোকেরা সমবেত হতো তখন হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। নামায শেষে মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিতেন এবং আলোচনা সাপেক্ষ্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হত। উক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা হত। সাধারণ এবং দৈনন্দিন বিষয়াদি (নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে) উক্ত মজলিসের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট মনে করা হত কিন্তু যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হতো সেক্ষেত্রে মুহাজির এবং আনসারের **'ইজলাসে আম'** বসত এবং সবার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সেই বিষয় নিষ্পত্তি হতো। সৈন্যদের বেতন, দফতরের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, কর্মকর্তা নিয়োগ, ভিনদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং তাদের ওপর করের হার নির্ধারণ- মোটকথা বহু বিষয় শূরায় উপস্থাপিত হয়ে নিষ্পত্তি হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে মজলিসে শূরার ইজলাস বসত। এছাড়া আরও একটি মজলিস ছিল, সেখানে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হত। এই মজলিস সর্বদা মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হত এবং কেবলমাত্র মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবী এতে যোগদান করতেন। বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাসমূহের দৈনন্দিন খবরাখবর যা খিলাফতের দরবারে পৌঁছত, হযরত উমর (রা.) সেই মজলিসে তা বর্ণনা করতেন এবং কোন আলোচনাযোগ্য বিষয় থাকলে এ বিষয়ে মানুষের মতামত নেয়া হতো। মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছাড়াও সাধারণ প্রজাদেরও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার অনুমতি ছিল। বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাসমূহের শাসক সাধারণত প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত করা হতো বরং কোন কোন সময় পুরো নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হত। কূফা, বসরা এবং সিরিয়ায় যখন খাজনা আদায়কারী নিযুক্ত করা শুরু হয় তখন হযরত উমর (রা.) উক্ত তিন প্রদেশে নির্দেশনা প্রেরণ করেন যে, স্থানীয়রা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী এক একজন ব্যক্তি মনোনীত করে যেন প্রেরণ করে যারা তাদের কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক সৎ এবং যোগ্য। হযরত উমর (রা.) কীভাবে কর্মকর্তা মনোনয়ন দিতেন, তাদের জন্য কী কী নির্দেশনা দিতেন, কীভাবে দিতেন- এ বিষয়ে লেখা আছে যে,

'গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হতো শূরার মাধ্যমে। যে ব্যক্তির বিষয়ে সকল শূরা সদস্য ঐক্যমত্য পোষণ করতেন, তাকে মনোনয়ন দেয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে প্রদেশ বা জেলার শাসককে আদেশ দিয়ে পাঠাতেন যে, যে ব্যক্তি অধিক যোগ্য, তাকে মনোনীত করে পাঠাও। অতএব, ঐসব নির্বাচিত লোককে হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তাদের জন্য অধিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এতে অনেক বড় প্রজ্ঞা নিহীত আছে যে, তারা যেন সততার সাথে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে, জাগতিক কোন লোভ-লালসা যেন না থাকে। হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তাদের এই উপদেশ দিতেন যে, স্মরণ রাখবে! আমি তোমাদেরকে শাসক ও কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি নি বরং ইমাম বানিয়ে প্রেরণ করেছি যেন লোকেরা তোমাদের অনুগামী হয়। মুলমানদের অধিকার প্রদান করবে। তাদের লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে প্রহার করবে না। শাস্তি দিবে না বরং তাদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকবে। অযথা কারো প্রশংসা করবে না পাছে সে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। তাদের জন্য সর্বদা নিজেদের দ্বার রুদ্ধ রাখবে না পাছে শক্তিধর দুর্বলদের গ্রাস করে বসে। নিজেকে কারো ওপর প্রাধাণ্য দিবে না পাছে তার প্রতি অন্যায় হয়। যে ব্যক্তি কর্মকর্তা নির্বাচিত হত, তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেয়া হত যে, সে তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, মিহি (সুতার) কাপড় পরিধান করবে না, মিহি আটা খাবে না, দরজায় প্রহরী রাখবে না, অভাবীদের জন্য সদা দ্বারা খোলা রাখবে। সকল কর্মকর্তার জন্য এসব দিকনির্দেশনা প্রণীত হয় এবং জনসম্মুখে তা পাঠ করে শোনানো হত। কর্মকর্তা নির্বাচন করার পর তাদের সহায়সম্পত্তির হিসাব নেয়া হত। কোন কর্মকর্তার আর্থিক অবস্থায় অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হলে সে যদি যথাযথ সদুত্তর দিতে না পারত তাহলে সে শাস্তির সম্মুখীন হত এবং অতিরিক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হত। কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশ ছিল যে, হজ্জের সময় যেন আবশ্যকীয়ভাবে সবাই একত্রিত হয়। সেখানে গণআদালত বসত, যেখানে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকলে তাৎক্ষণিক সুরাহা করা হত। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত ছিল যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যেতেন আর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত।

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত উমর (রা.)'র ঘটনা। কূফাবাসী খুবই বিদ্রোহী স্বভাবের ছিল। তারা সর্বদা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করতে থাকত যে, অমুক কাযী এমন, অমুকের মাঝে এই দুর্বলতা রয়েছে তো তমুকের মাঝে এই। হযরত উমর (রা.) তাদের অভিযোগ শুনে শাসক পরিবর্তন করে দিতেন এবং অন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করতেন অর্থাৎ পরিবর্তন করে অন্য কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাতেন। কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-কে এ-ও বলে যে, এই পদ্ধতি সঠিক নয় কেননা আপনি এভাবে কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে থাকলে তারা তাদের অভিযোগ অব্যাহত রাখবে। তাই আপনি কর্মকর্তা পরিবর্তন করবেন না, কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে থাকবো যতক্ষণ না কূফাবাসী নিজেরাই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এককাল পর্যন্ত যখন তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসতে থাকে তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, এবার আমি কূফাবাসীদের জন্য এমন

এক গভর্নর নিযুক্ত করবো যে তাদেরকে সোজা করে ছাড়বে। সেই গভর্নর ছিল ১৯ বছর বয়স্ক এক যুবক যাকে হযরত উমর (রা.) তাদের সোজা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ১৯ বছর বয়স্ক সেই যুবকের নাম ছিল আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা। কূফাবাসী যখন জানতে পারে যে, ১৯ বছর বয়সী এক ছোকরা তাদের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এসেছে তখন তারা বলে, আস! আমরা সবাই মিলে তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি। কূফাবাসী দুষ্ট তো ছিলই অধিকন্তু তারা বড় বড় জোব্বাধারী লোকদের যাদের বয়স ৭০-৮০ কিংবা ৯০ বছর ছিল, একত্রিত করে এবং ফন্দি আঁটে, বৃদ্ধদের সাথে শহরের সবাই আব্দুর রহমান-কে স্বাগত জানাতে যাবে এবং রসিকতার ছলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, জনাব! আপনার বয়স কত অর্থাৎ তার কাছে বয়স জানতে চাইবে। সে যখন উত্তর দিবে তখন আমরা সবাই মিলে হাসি-ঠাট্টা ও তিরস্কার করে বলবো, এই ছোকরা আমাদের গভর্নর হয়ে এসেছে! অতএব, পরিকল্পনা মাফিক তারা তাকে স্বাগত জানাতে শহর থেকে ২-৩ মাইল দূরে আসে। ততক্ষণে গাধার পিঠে আরোহণ করে আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা-ও পৌঁছে যান। কূফার সব মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের সারিতে বৃদ্ধ সর্দাররা ছিল। আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা যখন নিকটে এসে পৌঁছে তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি আমাদের গভর্নর হিসেবে এসেছেন এবং আপনার নাম কি আব্দুর রহমান? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন তাদের একান্ত বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, জনাব! আপনার বয়স কত? আব্দুর রহমান উত্তরে বলেন, আমার বয়সের ধারণা এভাবে করতে পার, মহানবী (সা.) যখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.)-কে ১০ হাজার সাহাবীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন, তখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.)'র বয়স যা ছিল আমার বয়স তার চেয়ে এক বছর বেশি। একথা শোনার সাথে সাথে কুয়াশা পড়লে যেমনটি হয় তারা সেভাবে লজ্জিত হয়ে পিছিয়ে যায় আর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, এই ছেলে যতদিন এখানে আছে সাবধান! কেউ কথা বলবে না নতুবা সে তোমাদের চামড়া তুলে ফেলবে। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং কূফাবাসী তার সামনে মুখ খুলতে পারত না।

অতঃপর রয়েছে যাকাত সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা। হযরত উমর (রা.) ইরাক এবং সিরিয়া বিজয়ের পর খাজনা সংক্রান্ত নিয়মনীতির প্রতি দৃষ্টি দেন। রাজা-বাদশাহ্রা যেসব জমি স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে রাজ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দিয়েছিল তা তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন আর একইসাথে হযরত উমর (রা.) এই আদেশ জারি করেন, যেসব আরব এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে তারা কৃষিকাজ করবে না অর্থাৎ আরবের অধিবাসীরা কৃষিকাজ করবে না। এই আদেশের একটি উপকারী দিক ছিল আর তা হল, কৃষিকাজ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের যে অভিজ্ঞতা ছিল, আরবরা উক্ত বিষয়ে অনবহিত ছিল। প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কৃষিকাজের রীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই এই নির্দেশ ছিল যে, বহিরাগতরা কৃষিকাজ করবে না বরং স্থানীয়রাই কৃষিকাজ করবে।

লোকদের কাছ থেকে পূর্বে বলপ্রয়োগ পূর্বক খাজনা আদায় করা হত। হযরত উমর (রা.) খাজনার নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করার পর খাজনা আদায়ের পদ্ধতিও অনেক সহজ করে দেন এবং নয়া পদ্ধতি চালু করেন। যিম্মীদের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিধর্মী প্রজাদের) প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন। খাজনা আদায় করার সময় রীতিমত জিজ্ঞেস করতেন যে, কারো প্রতি অন্যায় করা হয় নি তো। পারসী ও খ্রিস্টান যেসব বিধর্মী প্রজা ছিল তাদের কাছে পরামর্শ চাইতেন এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কৃষির উন্নয়নে হযরত উমর (রা.) অনাবাদি জমি সম্পর্কে বলেন, যে এতে চাষাবাদ করবে সে এর মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে। এজন্য তিন বছর সময় নির্ধারণ করা হয়। খাল খনন করা হয়। সেচ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যারা পুকুর ইত্যাদি খনন করার কাজও করতো। কৃষির উন্নয়নে এই ছিল তাঁর (রা.) পদক্ষেপ।

এ হল হযরত উমর (রা.)'র গুটিকয়েক কাজ যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। তাঁর (রা.) স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, বাদবাকী আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

(এখন) আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই, তা হল, আহমদীয়া এনসাইক্লোপিডিয়া বানানো হয়েছে, আজ এর উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রীয় আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার এটি প্রস্তুত করেছে। কিছুদিন পূর্বে তারা এই কাজের সূচনা করেছিলেন আর এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ওয়েব সাইট জামা'তের সদস্যদের জন্য অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। এর ঠিকানা হচ্ছে, www.ahmadipedia.org। যাতে Home Page -এ একটি সার্চ ইঞ্জিন এর সহায়তায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত খুঁজে বের করার জন্য সুযোগ থাকবে। এটি খুবই পাঠক-বান্ধব ও ব্যবহারের জন্য সহজ করা হয়েছে। জামাতের বই-পুস্তক, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, ঘটনাবলী, ধর্মবিশ্বাস এবং (জামাতের) স্থাপনাসমূহের বরাতে মৌলিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক এন্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, ভিডিও এবং জামাতী পত্র-পত্রিকায় (প্রকাশিত) প্রবন্ধাদির লিংক সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে এসব মাধ্যম থেকে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য প্রদত্ত লিংকগুলোর একটি উপকারিতা এটিও হবে যে, আহমদীয়া জামাতের অন্যান্য ওয়েব সাইট এর সাথেও পাঠকরা যুক্ত হতে পারবে আর তারা সকল পত্র-পত্রিকা থেকে উপকৃত হতে পারবে। বিশ্বময় বিস্তৃত জামাতের সদস্যদের কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যা (জামাতের) কোথাও রেকর্ডে বা সংরক্ষিত নেই। আহমদীপিডিয়া ওয়েবসাইটে Contribution নামেও একটি অপশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে পাঠকরা যে কোন বিষয়ে নিজেদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পাণ্ডলিপি সরবরাহ করতে পারবেন। এমন নয় যে, তারা নিজেই আপলোড করবেন বরং ব্যবস্থাপনাকে সরবরাহ করবেন। সরবরাহকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও সত্যায়নের পর সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধীনে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এভাবে এই ওয়েবসাইটটি পুরো জামাতের সহযোগিতায় একটি চলমান স্থায়ী প্রজেক্টে রূপান্তরিত হবে আর প্রত্যেক আহমদীর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। কেউ যদি ওয়েবসাইটে কোন কাঙ্ক্ষিত তথ্য (খুঁজে) না পায় তাহলে তিনি আহমদী পিডিয়ার (ব্যবস্থাপনার) সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এরপর তারা ওয়েবসাইটে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবে। অতঃপর এরা বলছে যে, যদিও এসব তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য ও সত্যায়িত সূত্রে সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু এরপরও যদি কোন পাঠক বা ভিজিটরের কাছে এমন সাক্ষ্য বা প্রমাণ থাকে যা কোন তথ্যের বিপরীত হয় তাহলে আমাদের কাছে এমন প্রমাণ প্রেরণ করুন, যাতে গবেষণা বা যাচাই-বাছাইয়ের পর জামাতের ইতিহাসকে

ষোলআনা নির্ভরযোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যায়। এই ওয়েবসাইট প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকল টেকনিক্যাল দায়িত্ব পালন করেছে কেন্দ্রীয় আইটি বিভাগ আর এই কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইটি বিভাগ অনেক পরিশ্রম করেছে, যাতে তাদের নিয়মিত কর্মীবৃন্দ ছাড়া স্বেচ্ছাসেবীরাও রয়েছে। তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আর্কাইভ বিভাগের মুরব্বীগণ ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরলস পরিশ্রম করেছে। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত উর্দূ থেকে অনুবাদ করে তা আপলোড করা, মোটকথা সকল কাজ সম্পাদনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সবাই কাজ করেছে। এই ওয়েবসাইট প্রস্তুত করার নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দিন। জুমুআর নামাযের পর আজ এই (ওয়েবসাইটের) শুভ উদ্বোধন করবো, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্র কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)